রায়তের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন
রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল
প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

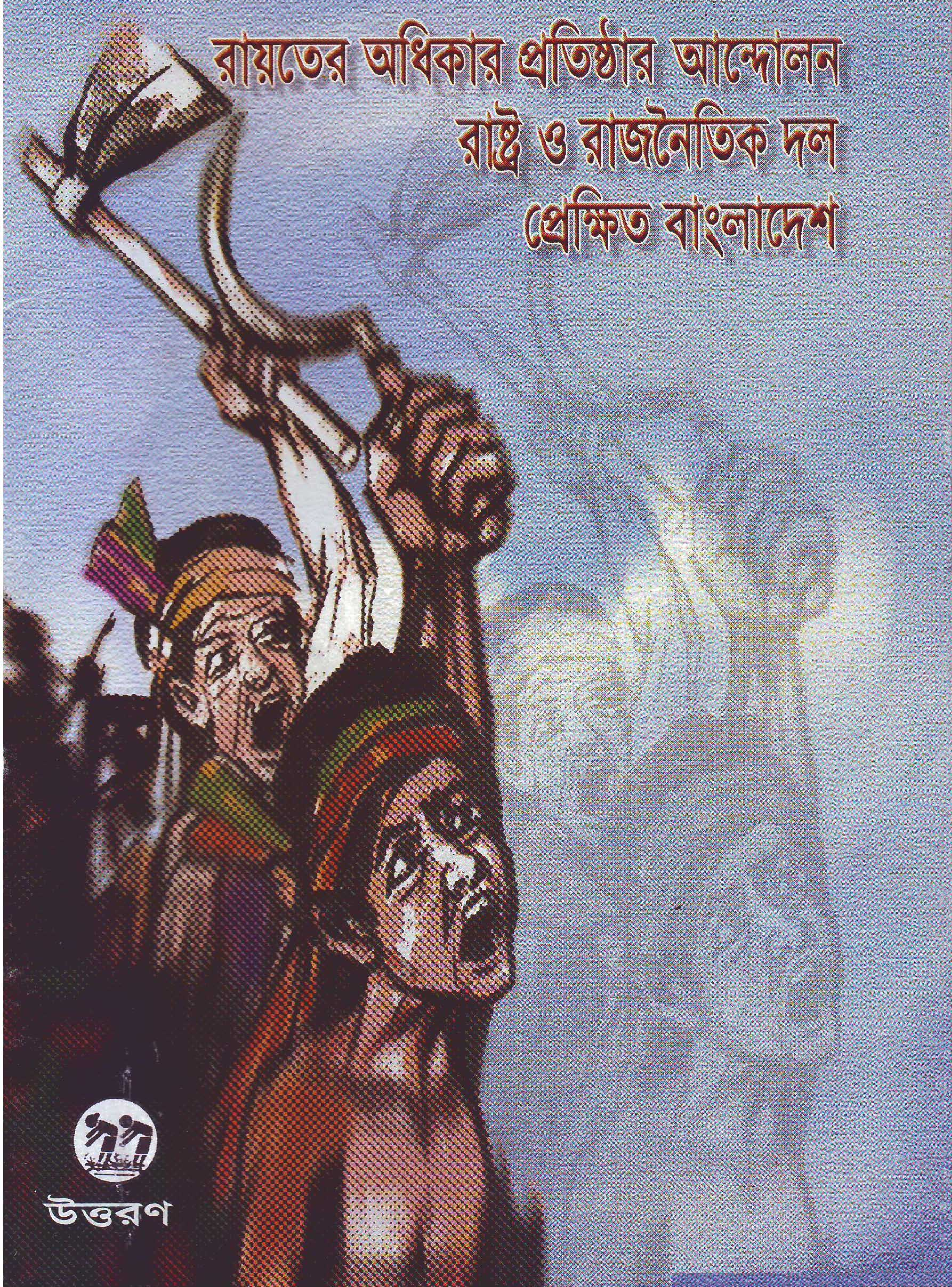

উত্তরণ

রায়তের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন
রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল
প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

রায়তের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

প্রকাশক	ঃ	উত্তরণ তালা, সাতক্ষীরা
প্রকাশকাল	ঃ	জুলাই ২০০১
প্রচ্ছদ	ঃ	শামীম আরফীন
মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা	ঃ	উপকূল প্রিন্টার্স ৫৫/২, ইসলামপু রোড, খুলনা।

প্রাক্‌কথন

বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষির অবদান সর্বোচ্চ। সেই হিসেবে ভূমি এদেশে সব সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অন্যায্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিদিন ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। বাংলাদেশের খাসজমির পরিমাণ নিতান্তই কম নয়। রাষ্ট্রের নিয়ম ও আছে কৃষি খাস জমি ভূমিহীনদের মাঝ বিতরনের। কিন্তু সে নিয়ম দুষ্টচক্রের যাতাকলে আটকে যাচ্ছে। আমরা মনে করি রাজনৈতিক দল, সুধী সমাজের এ বিষয়ে উচ্চকিত হওয়া খুবই দরকার।

উত্তরণ ভূমিহীন দরিদ্র নারী পুরুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। খাস জমিতে ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সামিল করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এরই অংশ হিসেবে বিষয়টি বিবেচনায় আনতে এই পুস্তিকাটি প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবে এবং সকল মানুষকে এ বিষয়ে যোগসূত্র স্থাপনে সহযোগিতা করবে এটাই আমাদের আশাবাদ।

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক
উত্তরণ

রায়তের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

শহিদুল ইসলাম

রায়ত বা প্রজার অধিকার আন্দোলন নতুন নয়। বাংলাদেশের ইতিহাসের নানা পর্যায়ে রায়তরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনা করে আসছেন। রাষ্ট্র হলো শক্তি প্রয়োগের বৈধতার কাঠামো কিন্তু এ কাঠামোতে রায়তরা অতীতে কখনোই অধিষ্ঠিত ছিলেন না। ফলে রাষ্ট্র রায়তের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে নাই। তবে বিংশ শতাব্দীতে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা স্বশাসিত হবার অধিকার অর্জন রায়তের পক্ষে রাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণকে সম্ভাবনাময় করে তুলেছিল। কিন্তু রায়তের স্বপ্ন, ভূমির উপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা, আজো বাস্তবায়িত হয়নি। অন্যদিকে স্বাধীন বাংলাদেশে ক্রমশঃ ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারীর প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেশে ভূমিহীনদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫৭ শতাংশ। এখন ভূমিহীনরাই হচ্ছেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সুবিধাবঞ্চিত অংশ। তাই বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ভূমিহীন রায়তদের উন্নয়ন। ভূমিহীনরা হচ্ছেন রায়ত বা প্রজা, সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশ হচ্ছে প্রজাতন্ত্র, তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের উদ্যোগী ভূমিকা থাকবে এমনটা প্রত্যাশা করা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ দারিদ্র বিমোচনের কথা বললেও জমির উপর ভূমিহীন রায়তদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা জোরে সোরে বলছেন না। ক্ষমতাসীন মহলের কর্মসূচীতে ভূমি সংস্কার তথা কৃষি সংস্কার প্রধান্য পাচ্ছে না।

কিন্তু অবস্থা এমন ছিল না, বৃটিশ ভারতে ১৯৩০ সালের দিকে রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মসূচীতে রায়তের অধিকার সমূহ অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্তমানে খাস জমির উপর ভূমিহীন রায়তদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রাজনৈতিক দলসমূহের সম্পৃক্ততা অনুল্লেখ্য। বরঞ্চ ভূমিহীন রায়তদের দাবী নিয়ে বৃহত্তর নাগরিক সমাজ দেন-দরবার, আন্দোলন করে যাচ্ছেন।

জনগণের অধিকার বলতে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে বোঝায় না। কারণ, জনগন কোন অখণ্ড রূপ নয়। জনগণ বলতে ধনী, দরিদ্র সবাইকে বোঝায়। প্রজাতন্ত্রের সংবিধান অনুসারে সকলকেই প্রজা বোঝানো হলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা আদায়ে সকল প্রজার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে সে দাবী বাংলাদেশে কেউ করবেন না। রায়ত বলতে আমরা ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে বোঝাতে চাই-কারণ তারাই জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের ও রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

জমির উপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নতুন নয়। ইতিহাসের দিকে তাকালে বোঝা যাবে কৃষক সর্বদা তার নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। বিরূপ পরিবেশে, শত নির্যাতনের মাঝেও কৃষির উৎপাদন অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমানেও কৃষিতে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৫ ভাগেরও বেশী, জমির উপর ভূমিহীনসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এখনও করা যায়নি। অনুপস্থিত ভূমি মালিকরাই জমির মালিকানার সিংহভাগ ভোগ করে আসছেন, যদিও তাদের তুলনায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদন ক্ষমতা শতকরা ৫০ ভাগ বেশী। দেশের কৃষি উৎপাদন, বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন, তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় বৃদ্ধি করতে চাইলে অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের পরিবর্তে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক কৃষক তথা রায়তকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বর্তমানে জি,ডিপি'র শতকরা ৪০ ভাগ আসে কৃষি খাত থেকে এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা আশিভাগ বসবাস করেন গ্রামে। কিন্তু গ্রামীণ জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভূমিহীন রায়তদের সংবিধান অনুসারে ভোট দেওয়ার অধিকার আছে, কিন্তু, বাস্তবে, উৎপাদনের মূল উপাদান ভূমির উপর তাদের কোন অধিকার নেই। রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে ভূমিহীন রায়তের জন্য তেমন কিছু করেন না। কিন্তু ইতিহাসের দিকে তাকালে বোঝা যাবে রায়তরা আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ কিছুটা হলেও এগিয়ে নিতে পেরেছেন। কিন্তু বর্তমানের ভূমিহীনদের আন্দোলনে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ সম্পৃক্ত ন'ন। এর কারণ বোঝা দুরুহ নয়।

ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী রায়তের বা ভূমিহীনদের ক্ষমতায়ন করতে নারাজ। রাষ্ট্রী সুয়োগ-সুবিধা যারা ভোগ করে আসছেন তারা জনগণের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। দারিদ্র বিমোচনের কথা বললেও তারা এ বিষয়ে আন্তরিক ন'ন। কৃষিতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি এবং সেই উদ্বৃত্তের সাহায্যে শিল্পের উন্নয়ন এবং তার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করার ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার উদাহরণ সকলেই দেন। কিন্তু এ কাজটি সে দেশে করা সম্ভব হয়েছে সিং ম্যানরীর সময়কার ভূমি সংস্কারের কারণে, সে বিষয়ে বির্তকের অবকাশ নেই। জমির উপর ভূমিহীন রায়তের অধিকার প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের জন্য জরুরী তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। নয়া প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব এ কথা যারা বলেন, তাদের জন্য বলতে হয়, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেও এই নয়া প্রযুক্তি সহায়ক। ক্ষুদ্র জোতের উৎপাদন বৃদ্ধিতে নয়া প্রযুক্তি সহায়ক-তাই ভূমিহীন রায়তের জমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলে, নয়া প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে খাদ্য রপ্তানীকারক দেশে রূপান্তরিত করা সম্ভব। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের " Distribution and Retention of khas land in Bangladesh" শীর্ষক গবেষণা রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, দেশে এখনও প্রায় ৩৩ লাখ একর খাস জমি রয়েছে। যার মধ্যে ৮ লাখ একর কৃষি খাস জমি, ৮ লাখ একর অকৃষি খাস জমি এবং ১৭ লাখ একর খাস জলাশয় রয়েছে। এ সকল খাস জমি ও জলাশয় ভোগ করছে স্থানীয় ভূস্বামী এবং জোতদাররা। ভূমিহীন রায়তের জমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠায় দাবী কাগজ-কলমে বিভিন্ন বে-সামরিক ও সামরিক সরকার স্বীকার করেছে এবং ভূমি সংস্কার আইন বা অধ্যাদেশ জারী করেছে। ভূমিহীন রায়তের মধ্যে খাস জমি বিতরণের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই

সব ভূমি সংস্কার নীতি বা অধ্যাদেশের সত্যিকারের প্রয়োগ ঘটে নাই। এ সম্পর্কে সত্যিকার জাতীয় উদ্যোগ অনুপস্থিত। অথচ, ১৯৩০ ও ১৯৪০ সালেও এ অবস্থা ছিল না। সে সময়ে রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মসূচীতে জমিদারী প্রথার বিলোপ, মহাজনদের সুদের চাপ থেকে পরিত্রাণ ইত্যাদি বিষয়, যা রায়তের স্বার্থ সম্পর্কিত, অন্তর্ভূক্ত ছিল।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিহীন রায়তরা আশা করেন বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে ভূমি সংস্কার ও খাস জমির উপর ভূমিহীন রায়তের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ঐকমত্য গড়ে উঠবে এবং এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আইন থাকা সত্ত্বেও খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে না। তার কারণ বুঝতে হলে আমাদের বাংলাদেশের ভূমি মালিকানার ইতিহাস, রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং রায়তের আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হবে।

রায়তের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাসঃ

প্রাচীনকালে উৎপাদনে কৃষকের দায়িত্ব থাকলেও ভূমির উপর তাঁর কোন অধিকার ছিল না। হিন্দু যুগে ভারতীয় ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা শর্ত সাপেক্ষে পরিচালিত হতো। রাজা তার নিজস্ব কর্মচারী বা স্থানীয় ভূ-স্বামীর মাধ্যমে আবাদযোগ্য জমির উপর কর নির্ধারণ করে দিতেন যা' কৃষক বা চাষী পরিশোধে বাধ্য থাকতো। মুসলিম শাসনামলে (১২০১-১৭৬৫) ভূমি ব্যবস্থাপনার নীতি প্রণীত হয়। সম্রাট শেরশাহ কবুলিয়ত বা পাট্টা চালু করেন, যা' ভূমির উপর কৃষকের অধিকারের প্রথম লক্ষণ। জমিতে উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা কার্যক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশ ছিল সম্রাটের প্রাপ্য। বাংলা প্রদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হ'বার পর ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডরমল এ প্রদেশে ভুমি রাজস্ব নির্ধারণের জন্য জরিপ কাজ পরিচালনা করেন। শস্যের পরিবর্তে নগদ অর্থে রাজস্ব প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেন। মুঘল আমলে জমিদাররা সম্রাটের পক্ষে রাজস্ব আদায় করতেন। এ রাজস্ব আদায় জমিদাররা সরাসরি করতেন না, করতেন অধ্বস্তন কর্মচারীদের মাধ্যমে। তারাই ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় প্রশাসন চালু করেন। ক্রমে তহশীল, থানা রাজস্ব অফিস ও অন্যান্য ভূমি দপ্তরের ধারনা সৃষ্টি হয়।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে ব্রিটিশরা। ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল অধিক রাজস্ব আদায়। রাজস্ব আদায়ের জন্য কৃষকের উপর যে নির্যাতন করা হতো তার ফলে ১৭৭০ সালে দেশ মহামারী ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। এই দুর্ভিক্ষে দেশের এক-তৃতীয়াশ লোক অর্থাৎ এক কোটি লোক মারা যায়। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস পাঁচশালা বন্দোবস্ত চালু করেন। সর্বোচ্চ নিলামধারীকে পাঁচ বছরের জন্য জমির ইজারা দেয়া হতো। ১৭৯৩ সালে চালু হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এ বন্দোবস্তে জমির উপর কৃষকের কোন অধিকার রইলো না, বরং জমিদাররা হলেন শর্তসাপেক্ষে জমির মালিক। কোম্পানীর অনুগত জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করে তাদের সহায়তায় ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম রাখা ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

কেবলমাত্র জমির উপর কৃষকের অধিকার কেড়ে নেয়া নয়, কৃষককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীলচাষে বাধ্য করা হতো ঊনবিংশ শতাব্দিতে। এর ফলে কৃষক নিঃস্ব সম্বলহীন হয়ে পড়ে। কৃষকের বা প্রজার অসন্তোষ বাড়তে থাকে, ঊনবিংশ শতাব্দির মাঝা-মাঝি নীল বিদ্রোহ, ১৭৮৩ সালে রংপুরে কৃষক বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। মোগল আমলে রায়তরা নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করতো, কিন্তু ব্রিটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে রায়তের জন্য করের কোন নির্দিষ্ট হার ছিল না। এই প্রেক্ষাপটে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাসত্ব Bengal Tenancy Act পাশ হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল ভূমি ভোগ ও দখলের ব্যাপারে প্রজাগণকে অধিকতর নিরাপত্তা প্রদান এবং প্রজাদের অসন্তোষ হ্রাস করা। এ আইনের ফলে ভূমির উপর সীমিত মাত্রায় প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনের বিধান ছাড়া খেয়াল-খুশিমত প্রজা উচ্ছেদ করার পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। এই আইনে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পায় তা হচ্ছেঃ

ক) ভূমির উপর প্রজার অধিকার ও স্বত্ব,
খ) ১২ বৎসর জমি দখলে থাকলে প্রজা হিসাবে স্বীকৃতি,
গ) প্রজার প্রয়োজনে জমি ব্যবহারের অধিকার,
ঘ) আইনের বিধান ছাড়া খেয়াল খুশিমত প্রজা উচ্ছেদ বন্ধ করা,
ঙ) উত্তরাধিকার সূত্রে (প্রজার) জমি ভোগ দখলের অধিকার,
চ) জমিদার তার খেয়াল খুশিমত খাজনা বৃদ্ধি না করতে পারে তার নিশ্চয়তা,
ছ) রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

১৯১৪ সালে প্রজা আন্দোলন শুরু হয়। পশ্চিমা ধাঁচের রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হওয়ায় কৃষকের দাবীসমূহ রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচীতে স্থান পায়। শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক প্রজা সাধারণের দাবীকে মূল রাজনৈতিক ধারায় তুলে ধরেন কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে। তার কর্মসূচীতে তিনি কৃষককে মহাজনের হাত থেকে রক্ষা করা, জমিদারদের সেলামী ও আবোয়াব আদায় বন্ধ করা, খাজনার পরিমাণ হ্রাস করা ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দেন। শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক ১৯৩৭ সালে নির্বাচিত হয়ে ঋণ সালিশী বোর্ড ও ১৯৩৮ সালে ফ্লাউড কমিশন গঠন করেন। ফ্লাউড কমিশন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিলের সুপারিশ করে এবং রায়ত বা প্রজাকে সরাসরি রাষ্ট্রের অধীনে আনার সুপারিশ ব্যক্ত করে। কিন্তু প্রাদেশিক আইন সভায় মুসলিম লীগের বিরোধীতার কারণে তা উত্থাপন করা যায়নি।

শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বৃটিশ সরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খরচ যোগাতে কৃষকদের উপর শোষণের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। তারাই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৩ সালে বাংলায় নেমে আসে এক ভয়াবহ মন্বন্তর। এতে প্রাণ হারায় প্রায় ৫০ লাখ লোক। চালের দাম বাড়ে ২০ গুণ, জমি বিক্রি বাড়ে ১৫ গুন, ৫% মানুষ তাঁদের সমস্ত জমি এবং ১২% মানুষ আংশিক জমি হারান।

এই পটভূমিতে গ্রাম বাংলায় সূচিত হয় তীব্র ও ব্যাপক কৃষক আন্দোলন। যা তে-ভাগা আন্দোলন নামে খ্যাত। গোটা উত্তর বঙ্গ, বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা, সিলেটের অংশ বিশেষসহ

যশোর ও খুলনায় এর ব্যাপকতা ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সাঁওতাল, গারো, হাজংসহ নানা অঞ্চলের আদিবাসী কৃষক এই আন্দোলনে সামিল হন।

পাকিস্তান পর্বঃ

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশের কর্তৃত্ব ত্যাগ করে, উদ্ভব হয় পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি দেশের। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব বাংলার অর্থ্যাৎ বর্তমান বাংলাদেশের হিন্দু জমিদাররা দেশ ত্যাগ করেন। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৫০ সালে East Bengal State Acquisition and Tenancy Act পাশ হয়। এ আইনের উদ্দেশ্য ছিলঃ-

১। জমিদারী ওমধ্যস্বত্বের বিলোপ সাধন।

২। সারাদেশ কৃষি জমি সম্বন্ধে রায়ত সৃষ্টি ও তাদেরকে জমির মালিক হিসাবে স্বীকৃতি দান।

৩। প্রজাস্বত্বের অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্র ও প্রজার মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন।

East Bengal State Acquisition and Tenancy Act এর বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়।

২। জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ৩৭৫ বিঘা নির্ধারণ করা হয়।

৩। নির্দিষ্ট সীমার (সিলিং উদ্ধৃত্ত) অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ ও ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

৪। যৌথ খামার সৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের লক্ষ্যে হোল্ডিং একত্রীকরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

৫। খাজনা হ্রাস ও বৃদ্ধির জন্যে যুক্তি সঙ্গত খাজনা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

৬। ভূমির রেকর্ড প্রস্তুত ও পুনঃ নিরীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা হয়।

৭। রায়ত কর্তৃক ভবিষ্যতে পুনঃ বন্দোবস্তের দ্বারা নতুনভাবে জমি প্রজাপত্তন (সাবলেটিং) নিষিদ্ধ করা হয়।

৮। কোন কোন ক্ষেত্রে রায়তকে হোল্ডিং থেকে উচ্ছেদ করা যাবে, তা নির্দিষ্ট করা হয়।

৯। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসহ অন্যান্য ২৬ টি বিধি বাতিল করা হয়।

এই আইনের মাধ্যমে প্রচুর জমি সরকারের অর্থাৎ রাষ্ট্রের আওতায় আসে এবং খাস জমিতে পরিণত হয়। রায়ত বা কৃষক প্রথমবারের মত সুস্পষ্টভাবে ভূমির মালিক হিসাবে আর্বিভূত হয়। পরবর্তীতে নানা সংশোধনীর মাধ্যমে মূল East Bengal State Acquisition and Tenancy Act এর ইতিবাচক দিকগুলোকে দূর্বল করা হয় ক্ষমতাসীন মহলের গোষ্ঠী স্বার্থ রক্ষায়। পাকিস্তান হবার অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পারেন যে তারা সত্যিকার অর্থে পরাধীন। ফলে শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। ১৯৫০ এর দশকে তৎকালীন পূর্ব

পাকিস্তানের অর্থাৎ বাংলাদেশে যুক্তফ্রন্টের স্বল্পস্থায়ী শাসনামলে কৃষকের দাবী তুলে ধরেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহ। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারীর মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন নস্যাৎ করবার উদ্যোগ নেয়া হয়। তথাপি জনদাবীর মুখে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান তাঁর শাসনামলে ভূমিসংস্কার নীতি ঘোষণা করেন এবং ভূমির সর্বোচ্চ মালিকানার সীমা ৩৭৫ বিঘায় নির্ধারণ করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় গেলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফের ঘোষণা দেন। গ্রামাঞ্চলে তখন জোতদার শ্রেণীর প্রভাব, প্রতিপত্তির কারণে ক্ষুদ্র ও পান্তিক কৃষক ক্রমশঃই ভূমিহীন হয়ে উঠে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও ভূমি সংস্কার কার্যক্রমঃ

এ অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সরকার ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে ভূমি-সংস্কার নীতি ঘোষণা করে। ১৯৭২ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ অনুসারে পরিবার ভিত্তিক ভূমি মালিকানার সিলিং ১০০ বিঘা করা হয় এবং ২৫ বিঘা কিংবা তার চেয়ে কম ভূমির মালিকদের জন্য ভূমির খাজনা মওকুফ করা হয়। এছাড়া সরকারী খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়। পয়োস্তি জমি ও নতুন চরজাগা ভূমি সরকারের খাস জমি হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আবর্তে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সপরিবারে দুঃখজনকভাবে নিহত হন। পরবর্তী সামরিক সরকার শেখ মুজিবর রহমান সরকারের ভুমি সংস্কার নীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন নাই। পরবর্তীতে এরশাদের সামরিক সরকার ১৯৮৪ সালে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ জারী করেন। ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ অনুসারেঃ

ক) ৬০ বিঘার উর্দ্ধে কৃষি জমির মালিকানা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদি কারো ৬০ বিঘার উর্দ্ধে কৃষি জমি থাকে তাহলে তা সরকারের মালিকানায় চলে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

খ) বেনামী লেন-দেন নিষিদ্ধ করা হয়। যার নামে সম্পত্তি ক্রয় করা হবে, সম্পত্তি তার বলেই গণ্য হবে। এ ব্যাপারে কোন বিরূপ সাক্ষ্য আদালতে গ্রাহ্য হবে না।

গ) কোন কৃষক বা পরিবারকে তার বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না- এ মর্মে আদেশ জারী করা হয়।

ঘ) চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বর্গাচাষ করা যাবে এবং বর্গাচাষীদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

এরশাদ সরকারও খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করার ঘোষণা দেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯৮৬-৯০ সাল পর্যন্ত থানা ও জেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণের সরকারী উদ্যোগের সাথে এনজিও 'রা সম্পৃক্ত হন। পরবর্তীতে বিএনপি সরকার (১৯৯১-৯৬) ভূমি সংস্কারে) তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণের লক্ষ্যে থানা ও জেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করে। ১৯৯৭ সালে রাঙ্গামাটি বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি এই তিনটি জেলা বাদে বাকী ৬১ টি জেলার বন্দোবস্তযোগ্য সকল কৃষি খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের নীতিমালা ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা ভিন্ন। এ সকল খাস জমি স্থানীয় বড় জোতদারদের দখলে এবং তাদের রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। তাঁরা জমির ক্যাটাগরি পরিবর্তন, ভূয়া দলিল তৈরী করে স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা ও পুলিশের সহায়তায় খাস জমি থেকে ভূমিহীনদের উচ্ছেদে লিপ্ত। সাতক্ষীরা জেলার বাবুরাবাদ এলাকায় ১৯৯৮ সালে এ ধরণের ঘটনা ঘটে। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমূহ ও স্থানীয় নাগরিক সমাজ ভূমিহীনদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন।

একটা কথা পরিস্কার বলা দরকার, খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের জন্য বা ভূমি সংস্কারের জন্য নতুন কোন অধ্যাদেশ বা আইন জারী করার দাবী আমরা করছি না। আমরা দাবী জানাই ঘোষিত নীতি বাস্তবায়নের। ঘোষিত নীতি বাস্তবায়িত হলে ১০ থেকে ১২ লাখ একর জমি ভূমিহীনদের অধিকার আসবে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে- বাংলাদেশ নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে প্রয়োজনে খাদ্য রপ্তানী করতে সমর্থ হবে। এ দেশের গরীব ও নিঃস্ব জনগণ বারংবার প্রমান করেছেন তারা সৎ, উদ্যোগী এবং উৎপাদনশীল। জাতীয় রপ্তানী আয় বৃদ্ধি থেকে কৃষি উৎপাদন সর্বত্রই তাঁরা আশার আলো দেখাচ্ছেন। যারা সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করছেন এবং প্রান্তিক কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং সে জ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁরা জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহসহ রাষ্ট্রের আন্তরিক উদ্যোগে সাহায্য করতে সক্ষম। প্রয়োজন আন্তরিক ও দৃঢ় উদ্যোগের। ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলগুলো আন্তরিক হবেন আমরা সে আশাই করি। বৃহত্তর অর্থে রাষ্ট্র একটি পরিবার। পরিবারের দূর্বল সদস্যকে সাহায্য করা পরিবারের পরিচালকের কর্তব্য। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন রায়তের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ রাষ্ট্রের পরিচালকরা তথা রাজনৈতিক দল সমূহ উদ্যোগী হবেন আমরা সে প্রত্যাশা করি।

বাবুরাবাদ থেকে জায়েদানগর: ভূমিহীনদের রক্তাক্ত আন্দোলনের ইতিকথা

-শহিদুল ইসলাম

ভূমিকাঃ

১৯৯৮ সালের ১০ই মে সাতক্ষীরা জেলার বাবুরাবাদ ও তৎসংলগ্ন গ্রাম সমূহে দূর্ণীতিপরায়ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহের সাথে যোগসাজসে অবৈধ জমি দখলকারীরা নিরপরাধ ভূমিহীনদের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে ২৬৫টি ঘরবাড়ী ভস্মীভূত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়, নিরপরাধ মহিলা ও শিশুদের উপর অত্যাচার করা হয় এবং জমি ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। দখলদার বাহিনীর গুলিতে নিহত হয় গৃহবধু জায়েদা। আহত হয় অসংখ্য নারী পুরুষ শিশু। স্থানীয় প্রচারমাধ্যমে এ ঘটনা ব্যাপক প্রচার পায় এবং জাতীয় প্রচার মাধ্যমও এ ঘটনাকে গুরুত্বসহকারে তুলে ধরে। পুলিশ ও ভাড়াটিয়া গুন্ডাবাহিনীর অমানবিক অত্যাচারের পেক্ষাপটে নাগরিক সমাজ বিশেষ করে এনজিও মহল ভূমিহীনদের পক্ষ অবলম্বন করে। অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে ভূমিহীনদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে উঠে এবং তা প্রচার মাধ্যম ও নাগরিক সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ভূমিহীনরা অবৈধ জমি দখলকারীদের বিপক্ষে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ভূমিহীন নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। তিনটি প্রধান বিরোধীদলের প্রধানরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং সর্বশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমিহীনদের সমাবেশে বক্ততা করেন। তিনি এই ঘটনার সুষ্ঠ বিচার এবং ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরন করার ঘোষনা প্রদান করেন।

প্রেক্ষাপটঃ

বাংলাদেশ ৫৫ হাজার বর্গমাইলের একটি ক্ষুদ্র দেশ, যার জনসংখ্যা ১২ কোটি। এদেশের উর্বর পলিমাটির জন্যে জনাধিক্য অত্যন্ত বেশী। শতকরা ৮০ ভাগ জনগণ গ্রামে বসবাস করে এবং তাঁদের মূল পেশা কৃষি। বর্তমানে জিডিপি'র শতকরা ৪০ ভাগ আসে কৃষিখাত থেকে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী গ্রামীণ জনসংখ্যার ৬৬ ভাগ ভূমিহীন যদিও তারা কৃষি উৎপাদনের মূল শক্তি।

অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের (Absentee landlord) তুলনায় ক্ষুদ্র কৃষকের উৎপাদন ক্ষমতা শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বেশী। আবাদযোগ্য মোট ২৪.২ মিলিয়ন একর জমির ১৫ মিলিয়ন একরে ধান উৎপাদন করা হয়। বছরে দুই ফসল আবাদ ব্যবস্থাপনায় খাদ্য উৎপাদন ৪০ থেকে ৫০ মিলিয়ন টন উন্নীত করা সম্ভব। অর্থাৎ বাংলাদেশ একটি খাদ্য রফতানীকারক দেশে পরিণত হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ বর্তমানে বছরে ২.৫ থেকে ৩ মিলিয়ন টন খাদ্য আমদানী করে। অসম ভূমি মালিকানা ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তির অপ্রতুলতা, অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের অনীহা ভূমির উৎপাদন সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহারকে বাধাগ্রস্থ করেছে। এছাড়াও সেচ, ভর্তুকী, প্রযুক্তি সংক্রান্ত নানারকম সমস্যা রয়েছে।

বৃটিশ উপনিবেশিক এবং পাকিস্তানি শাসন আমলে একদিকে যেমন রায়তরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলে অন্যদিকে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলগুলোও রায়তের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কিছু পরিমান হলেও ভূমিকা রাখে। ১৯২১ ও ১৯৩০ সালের রাজনৈতিক কর্মসূচীতে ভূমি সম্পর্কিত ইস্যু সমূহ যেমন, ভূমি সংস্কার, জমিদারী প্রথার অবসান, কৃষকের জমির অধিকার, মহাজনদের কাছ থেকে কৃষকের পরিত্রাণ অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৩০ দশকে ঋণ শালিসী বোর্ড ও Tenancy Law চালু করার চেষ্টা করা হয়। ১৯৪০ এর দশকে গড়ে উঠে বিখ্যাত তেভাগা আন্দোলন। ইতোমধ্যে বৃটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশের কর্তৃত্ব ত্যাগ করে এবং পাকিস্তান ও ভারত নামের দু'টি দেশ জন্মগ্রহণ করে। ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথার বিলোপ করে State Acquisition & Tenancy Act পাশ করে তৎকালীন সরকার। ঐতিহাসিকভাবে কৃষক তাঁর জমির উপর কর্তৃত্ব লাভ করে এই আইনের মাধ্যমে। পরবর্তী সরকারগুলি খাস জমির বিষয়ে আন্তরিক ছিলেন না, তবে জনদাবীর মুখে ভূমি সংস্কারের ইস্যু একেবারে অগ্রাহ্য করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এমনকি একনায়ক আইয়ুব খান তার সময়ে ভূমি সংস্কার নীতি প্রণয়নে বাধ্য হন। ১৯৭১ সালে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে এ দেশে। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জনের পর শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে। গরীব কৃষকের কষ্ট ও যন্ত্রণা সম্পর্কে শেখ মুজিবের পূর্ণাঙ্গ ধারণা ছিল। সেজন্যে ১৯৭৩ সালে তিনি ভূমি সংস্কার নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতি অনুসারে ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণ শুরু হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির আবর্তে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট শেখ মুজিব সপরিবারে দুঃখজনকভাবে নিহত হন। পরবর্তী সামরিক সরকার শেখ মুজিবের ভূমি সংস্কার নীতি স্থগিত ঘোষণা করেন। কিন্তু জনমতের চাপে ১৯৮৪ সালে এরশাদের সামরিক সরকার ভূমি সংস্কার নীতি গ্রহণ করে। ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার নীতিতে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ, জমি ক্রয় নিয়ন্ত্রন এবং সরকারী খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। এই নীতি প্রয়োগ করার জন্য ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯০ সালে থানা ও জেলা এনজিওরা সম্পৃক্ত হয় এবং সহায়তা প্রদান করে। পরবর্তীতে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসে এবং ১৯৯১-৯৬ সাল পর্যন্ত তাদের ক্ষমতাসীন থাকাকালে, রহস্যময় কারণে বিএনপি ভূমি সংস্কারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং ভূমি বিতরণের জন্য থানা ও জেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করে ও কিছু খাসজমি ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ হয়। কিন্তু এই খাস জমি বিতরণ ও বিতরণের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। কারণ বড় বড় ভূ-স্বামী ও জোতদাররা নানান কৌশলে রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনকে প্রভাবিত করে ভূয়া দলিলের মাধ্যমে অবৈধভাবে খাসজমি দখল বজায় রেখেছে। যদিও ভূমিহীনরা কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এরকম একটি রক্তাক্ত আন্দোলন সংগঠিত হয় সাতক্ষীরা জেলার বাবুরাবাদ গ্রামে।

বাবুরাবাদের ঘটনা ও অত্যাচারের কাহিনীঃ

১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা বিলোপের মাধ্যমে বাবুরাবাদ ও তৎসংলগ্ন গ্রামসমূহের ৩২০০ একর জমি সরকারী মালিকানার আওতায় আসে। কিন্তু স্বার্থন্বেষী মহল আইনের ফাঁক-ফোকরের মাধ্যমে এ জমির উপর তাদের দখল অব্যাহত রাখে। ১৯৭২ সালে সমস্ত জমি পুনরায় খাসজমি হিসাবে ঘোষিত হয় এবং ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অবৈধ জমি দখলকারীরা তাদের দখল বজায় রাখতে সমর্থ হয়। ১৯৮৫ সালে এ সমস্ত জমি পুনরায় খাসজমি হিসাবে ঘোষিত হয় ও তা' বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। ইতোমধ্যে স্বার্থন্বেষী মহল এ জমির ক্যাটাগরি খাসজমি থেকে জলমহালে পরিণত করতে সমর্থ হয়। এই স্বার্থান্বেষী মহল কিছু দূর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মকর্তা ও ক্ষমতাশীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতা পায়। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৮৪ সালের ঘোষণা অনুযায়ী খাস কৃষি জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণযোগ্য কিন্তু বন, জলমহাল ও অকৃষি খাস জমি বিতরণের আওতায় পড়ে না। উচ্চতর আদালতের রায় অনুসারে এ সমস্ত জমির উপর স্বার্থান্বেষী মহলের অধিকারের আইনী বিলোপ ঘটে। ১৯৯৭ সালে উচ্চতর আদালতের রায় পরিবর্তিত হয় এবং স্বার্থান্বেষী মহল এ জমির লীজ অশুভ পন্থায় লাভ করে। লীজ লাভ করার পর এই স্বার্থন্বেষী মহল দূর্নীতিপরায়ণ স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় পুলিশের সাথে আঁতাতের মাধ্যমে ১৯৯৮ সালের ১০ই মে বাবুরাবাদ ও তৎসংলগ্ন গ্রামে ভূমিহীনদের উচ্ছেদ করার জন্য সাড়াশী আক্রমণ চালায়। সরকারী আইন অনুযায়ী একমাত্র ভূমিহীনরা খাস জমির মালিকানা লাভ করতে পারে এবং তাদের বসতি থেকে কেউ উচ্ছেদ করতে পারে না। এই আক্রমণের কারণে ২৬৫ টি ঘরবাড়ী ভস্মীভূত ও বিধ্বস্ত হয় এবং শত শত লোক আহত হয়। আক্রমণের আকস্মিকতার কারণে ভূমিহীনরা সংগঠিত প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়। এ ঘটনা সাধারণ মানুষ, শিক্ষক, সাংবাদিক ও বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তারা এ ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। ভূমিহীনরা সংগঠিত হয় এবং ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে আবেদন করা হয়। কিন্তু এ সব আবেদন-নিবেদনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে স্বার্থান্বেষী মহল উৎসাহিত হয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত ভাড়াটিয়া বাহিনীর মাধ্যমে ১৯৯৮ সালের ২৭ শে জুলাই পুনরায় আক্রমণ করে ভূমিহীনদের উচ্ছেদ করার জন্য। এইবার ভূমিহীনরা সংগঠিত ছিল এবং তাঁরা ভাড়াটিয়া বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। এক পর্যায়ে পুলিশ ও ভাড়াটিয়া বাহিনী ভূমিহীনদের উপর গুলিবর্ষণ করলে গৃহবধু জায়েদা নিহত হয় এবং ২২৯ জন যাদের অধিকাংশ মহিলা আহত হয়। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষ করে সাতক্ষীরার অধিবাসীরা এ ঘটনায় বিক্ষুদ্ধ হয়ে পড়ে। গড়ে উঠে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। ভূমিহীনদের প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাকে সর্বস্তরের জনতা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং প্রায় সাত দিন সাতক্ষীরা শহর অচল হয়ে পড়ে। আন্দোলনের পক্ষ থেকে নিম্নবর্নিত ৭ দফা দাবী পেশা করা হয়ঃ

১। ঘটনার সাথে জড়িত দূর্নীতিপরায়ন সরকারী কর্মচারীদের প্রত্যাহার ও বিচার করতে হবে।

২। আলোচ্য জমির ক্যাটাগরি "জলমহাল" থেকে পরিবর্তন করে খাস জমি করতে হবে।

৩। গুলিতে নিহত জায়েদার পরিবার ও ১৯৯৮ সালের ২৭ শে জুলাই গুলিতে আহতদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৪। জায়েদার হত্যা মামলা করতে হবে এবং দোষীদের বিচার করতে হবে।

৫। ভূয়া ও অবৈধ দলিলের মাধ্যমে দখল করা সকল খাস জমি সরকারী মালিকানার আওতায় আনতে হবে।

৬। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির Term of Reference এ ভূমিহীন ও খাস জমি সম্পর্কিত সকল ঘটনা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৭। স্বার্থান্বেষী মহলের সকল নেতৃবৃন্দকে এবং ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে অন্যান্যদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচার করতে হবে।

আন্দোলনের যখন তীব্রতা বৃদ্ধি পায় তখন প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। এবং ভূমিহীনদের সমাবেশে বক্তৃতা করেন ও ভূমিহীনদের দাবীর প্রতি অকুন্ঠ সমর্থন প্রদান করেন। পরিস্থিতির যেন আর অবনতি না ঘটে সে লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগষ্ট মাসের ১৮ তারিখে এ এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ভূমিহীনসহ বিশাল জনসমাবেশে ভূমিহীনদের ৭ দফা দাবীর প্রেক্ষিতে ঘোষণা করেনঃ

- দেবহাটা ও কালিগঞ্জ থানার খাস জমি সরকারী আইন ও পদ্ধতি অনুসারে ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।
- আশ্রয়হীন পরিবার সমূহকে আশ্রায়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হবে।
- নিহত জায়েদার পরিবারকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপুরণ ও আহতদের চিকিৎসা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হবে।
- এক সদস্য বিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি ঘটনার তদন্ত করবে এবং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দোষীদের বিচার করা হবে।

এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে আন্দোলনের তীব্রতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। উল্লেখ্য দেবহাটা ও কালীগঞ্জ এলাকার ভূমিহীনদের সমর্থনে সাতক্ষীরা জেলার অন্যান্য থানার ভূমিহীনরা এগিয়ে আসেন এবং আন্দোলনে যোগ দেন।

সুধী সমাজের ভূমিকাঃ

ভূমিহীনদের সংগঠিত ও খাস জমির উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুধীসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সংগঠন আইডিয়াল, সুশীলন উত্তরণের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং আন্দোলনে যোগ দেয়। সমাজের সকল স্তরের সুধীজনকে নিয়ে ***ভূমিহীন উচ্ছেদ***

প্রতিরোধ সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। সমন্বয় কমিটি প্রতিদিন আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠন যেমন চিকিৎসক সমিতি, আইনজীবী সমিতি, শিক্ষক ও সাংবাদিক সমিতি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং আন্দোলনে তাদের সমর্থন লাভ করে। এলাকার সাংবাদিকদের জন্য ভূমি সংস্কারের উপর বিভিন্ন ওরিয়েন্টশন কোর্স পরিচালনর করা হয়, যেন তারা এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারেন। এছাড়াও লিফলেট, পোষ্টার, পুস্তিকাসমূহ প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়।

খুলনা শহরেও এ ধরনের কমিটি গঠন করা হয়। ঢাকায় বসবাসরত সাতক্ষীরার অধিবাসীরা "সাতক্ষীরা অধিকার কমিটি" গঠন করে। উত্তরণ এ সমস্ত সংগঠনকে আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তরণ সাতক্ষীরা, খুলনা এবং ঢাকায় ২২৯ জন আহতদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের বিরুদ্ধে যে সব মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে তাদের আইনী সহায়তা প্রদান করে উত্তরণ। এ সমস্ত মামলায় ৫০৩ জন অভিযুক্ত হয়ে নিম্নতম আদালত (ম্যাজিষ্ট্রেট) ও সর্বোচ্চ আদালতে।

এনজিওদের সর্বোচ্চ সংস্থা এডাব (খুলনা বিভাগ ও কেন্দ্রীয় পর্যায় - উভয় ক্ষেত্রেই) ভূমি সংস্কারের বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী। এএলআরডি হচ্ছে এমন একটি সংগঠন যা' ভূমি সংস্কারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। উত্তরণ এই সংগঠনসমূহের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয় ভূমিহীনদের দাবী জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরার জন্য। এডাবের সভাপতি ডঃ কাজী ফারুক আহমেদ এবং এএলআরডি'র সভানেত্রী খুশী কবির মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সিনিয়র মন্ত্রীদের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করেন এবং ভূমিহীনদের দাবীর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। এনজিও নেতাদের এই সব কর্মতৎপরতার ফলে ভূমিহীনদের দাবী জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব লাভ করে।

আন্দোলনের ফলাফলঃ

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণে পরিচালিত আন্দোলন সমুহের মধ্যে বাবুরাবাদ আন্দোলন এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। এ আন্দোলনের ফলাফল স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বহুমুখী:

১। ভূমিহীনদের আন্দোলনে নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জায়েদা প্রাণ দেয় এবং আরো দেড়শ জন মহিলা আহত হয়। র‍্যালী, মিটিং, সমাবেশের শতকরা ষাট ভাগ ছিল নারী। সমাজের দৃষ্টিতে নারীর ভূমিকার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে এ আন্দোলনের মাধ্যমে। কৃতজ্ঞ জনতা বাবুরাবাদ এলাকার নামকরণ করেছে শহীদ জায়েদার নামানুসারে 'জায়েদানগর'। জাতীয় এনজিও নেতৃবৃন্দসহ হাজার হাজার মানুষ জায়েদার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

২। এই আন্দোলন এই ইঙ্গিতই বহন করে যে, বাংলাদেশে সুষম সম্পদ বন্টনের লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার অত্যন্ত জরুরী।

৩। বিচার বিভাগীয় কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ভূমি মন্ত্রণালয় নয় সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে ভূমির পুনঃতফসিলকরণ ও সরকারী খাস জমি বন্টনের লক্ষ্যে। টাস্ক ফোর্স ইতোমধ্যে ৯০০ পরিবারকে ভূমিহীন হিসাবে নথিভূক্ত করেছে, যে তালিকা ভূমি মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে। এখন তাদের মধ্যে জমি বিতরণ ও হস্তান্তরের দলিল প্রস্তুতি প্রক্রিয়া চলছে।

৪। ভূমিহীনদের দাবী অনুসারে ঘটনার সাথে জড়িত প্রায় সকল সরকারী কর্মকর্তাকে বদলী করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৫। আহতদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, নিহত জায়েদার পরিবার ও আহতদের পরিবারসমূহকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে।

৬। এই আন্দোলনের সামাজিক প্রভাব ব্যাপক। সাতক্ষীরা ও তৎসংলগ্ন খুলনা জেলায় ভূমিহীনরা অধিকতর মাত্রায় সুসংগঠিত হচ্ছে এবং এক লক্ষ একর সরকারী খাস জমির উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে ভূমিহীনরা ইতোমধ্যেই খাস জমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে বৃহৎ ভূ-স্বামীরা খাস জমি ভোগদখল করছে, সে সব অঞ্চলে ভূমিহীনরা সংগঠিত আন্দোলন পরিচালনা করছে। সাতক্ষীরা জেলার তালা, আশাশুনি থানা সমূহ ও খুলনা জেলার পাইকগাছা থানায় ভূমিহীনদের খাস জমির দখল লাভ হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৭। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের শতকরা ৭০ ভাগ জমি চিংড়ী চাষে নিয়োজিত। চিংড়ী চাষের ব্যাপক প্রসারের ফলে হাজার হাজার প্রান্তিক কৃষক জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। প্রান্তিক চাষীদের যারা জমি হারিয়েছে, তারা এখন সংগঠিত হচ্ছে নব্য চিংড়ী চাষীদের বিরুদ্ধে। তালা উপজেলার চিংড়ী বিরোধী আন্দোলন এ ক্ষেত্রে দেশে অনন্য উদাহরণ।

৮। নাগরিক সমাজ তাদের ক্ষমতার তাৎপর্য অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছে। তারা এখন বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠা সামাজিক ও মানবাধিকার আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থন দিচেছ।

৯। এ অঞ্চলে কর্মরত এনজিও-দের কর্ম কৌশলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। ইতিপূর্বে তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানব উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণের মতন জাতীয় ইস্যুগুলোতে কর্মরত ছিল। বর্তমানে তারা স্থানীয় ও আঞ্চলিক সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করছে এবং অনুধাবন করেছে যে, সুবিধাহীন নিম্নবিত্ত মানুষকে কেবল সেবা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতি করা যাবে না।

ভূমিহীনদের খাস জমি প্রদানের মাধ্যমে তাদের সংঘটিত করে ক্ষমতায়ণ করার লক্ষ্যে এনজিওরা তাদের নতুন কৌশল খুঁজে পেয়েছে।

১০। যেহেতু ক্ষমতাশীন দলের বহু নেতা কর্মীকে স্বার্থান্বেষী অবৈধ জমি দখলকারীদের সাথে আঁতাত করতে লক্ষ্য করা গেছে, সেকারণে দলীয় হাইকমান্ড স্থানীয় কমিটি ভেঙ্গে দেন। বর্তমানে আওয়ামীলীগের স্থানীয় অধিকাংশ নেতা/কর্মীরা সামাজিক আন্দোলনের তাৎপর্য অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছেন এবং আন্দোলনে সমর্থন দিচেছন।

উপসংহার ঃ

তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভূমিহীনদের আন্দোলন এ দেশের কৃষক আন্দোলনে একটি মাইল ফলক। এ আন্দোলনের ফলে স্বার্থন্বেষী মহলের অবৈধ জমি দখলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এ ধরণের আন্দোলন এবং তা নাগরিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও এনজিও'দের প্রত্যক্ষ সমর্থন লাভের ফলে ভূমিহীনদের জন্য রাজনৈতিক অবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এখনও অনেক দূর যেতে হবে। খাস জমির উপর ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃত্বদানকারীর ভূমিকা রয়েছে।

আমরা দাবী জানাই ঘোষিত নীতি ও আইনসমূহ বাস্তবায়নের। ঘোষিত নীতি বাস্তবায়িত হলে ১০ থেকে ১২ লাখ একর জমি ভূমিহীনদের অধিকার আসবে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে- বাংলাদেশ নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে প্রয়োজনে খাদ্য রপ্তানী করতে সমর্থ হবে। এ দেশের গরীব ও নিঃস্ব জনগণ বারংবার প্রমান করেছেন তারা সৎ, উদ্যোগী এবং উৎপাদনশীল। জাতীয় রপ্তানী আয় বৃদ্ধি থেকে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহারে সর্বত্রই তাঁরা আশার আলো দেখাচ্ছেন। প্রয়োজন আন্তরিক ও দৃঢ় উদ্যোগের প্রয়োজনে এমন একটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা যার ফল প্রকৃত ভূমিহীনরা ভূমি পাবেন। সিলিং উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার করা সম্ভব হবে। ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণে সরকারসহ রাজনৈতিক দলগুলো আন্তরিক হবে আমরা সে আশাই করি।